চিন্তন

যে-জ্যোতিতে ভাস্বর হৃদিকন্দর

ফাদার জর্জ পনোডাথ এস জে

[রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর বিবেকানন্দ হলে গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩ ‘The Light that Shines Deep within’ বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র ‘Bulletin’-এর ডিসেম্বর ২০১৪ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন **সুমনা সাহা**।]

ক্রিসমাস এমন এক উৎসব, যে-দিনটিতে পৃথিবীতে ঈশ্বরের আগমন ঘটেছে। এটি দুহাজার বছর আগে কোনও এক মধ্যপ্রাচ্য দেশে নিছক একটি শিশুর জন্মের ঘটনামাত্র নয়। সেদিন যা ঘটেছিল, তা আজ এক ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত। কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঈশ্বরের অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার ঘটনাকে তো স্থান-কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে না। তা সর্বকালে, সর্বত্র ঘটে থাকে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, “Have you not heard His silent steps? He comes, comes, ever comes. Every moment and every age, every day and every night He comes, comes, ever comes.”

অতএব ক্রিসমাসের উৎসব মানে আরও অনেক কিছু। ২৫ ডিসেম্বর তাঁর আগমন—আমাদের সংস্কৃতিতে, আমাদের ঘরে ঘরে ও আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে—এইভাবে তাঁকে স্মরণ করতে আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি। আমি অনুরোধ করব যেন আপনারা ধর্ম ও প্রথার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে ঠান্ডা মাথায়, ধীর-স্থির যুক্তি ও বিচারের নিরিখে দিনটিকে চিন্তা করতে পারেন। একমাত্র তখনই আমরা আজকের দিনে খ্রিস্টের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারব। তা না হলে এটি দুহাজার বছর আগেকার এক শিশুর জন্মদিনের শূন্যগর্ভ অনুষ্ঠানমাত্র হয়ে দাঁড়াবে। ক্রিসমাসকে বাস্তব করে তুলতে হবে—যা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রবেশের একটি একান্ত ব্যক্তিগত ঘটনা। যখন তা সত্য হয়ে উঠবে, তখনই ক্রিসমাস হয়ে উঠবে সত্যিকারের ‘বড়দিন’।

এই পুণ্য দিনে, আমি যিশুখ্রিস্টের দুটি সরল অথচ তাৎপর্যপূর্ণ উক্তির পর্যালোচনা করে দেখব :

১। তোমরাই জগতের আলোকবর্তিকা (You are the light of the world)

২। তোমরাই ধরিত্রীর লবণ (You are the salt of the earth)

উপরিউক্ত উক্তিদুটির মর্ম ও পূর্ণ তাৎপর্য

অনুধাবন করতে হলে, আমাদের আরও দুটি চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। সেগুলির নাম দেওয়া যায়—'মনের সাহায্যে জীবনযাপন' এবং 'হৃদয়ের সাহায্যে জীবনযাপন' (Living by the mind and living by the heart)। অবশ্যই আপনারা বলতে পারেন, বেঁচে থাকতে গেলে আমাদের 'মন' (বুদ্ধি) ও 'হৃদয়' (অনুভূতি বা সংবেদনশীলতা) দুই-ই প্রয়োজন। কিন্তু আমি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখছি না। এগুলি কেবল ধারণার বিষয় নয়, এগুলি জীবনযাপনের দুটি ভিন্ন ভিন্ন শৈলী।

যাঁরা 'মনোময়' জীবনযাপন করেন—তাঁদের বৈশিষ্ট্য কী কী হতে পারে? তাঁরা অত্যন্ত যুক্তিবাদী; তাঁরা কার্য-কারণ, সঠিক-বেঠিক, বর্তমান ও ভূত-ভবিষ্যৎ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকেন। তাঁরা কেবল বাহ্য বিষয়ের প্রতিই নজর দেন, কারণ তাঁদের অন্তর্দৃষ্টির অভাব। তাঁরা আইন মেনে জীবনযাপন করেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইন প্রণয়নের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিয়ে মাথা ঘামান না, বরঞ্চ আক্ষরিক অর্থে আইনমাফিক জীবনযাপন করেন। বৌদ্ধিক স্তরের নির্দেশে চলা এই ব্যক্তিরা নীতির দিক থেকে সঠিক, তাঁরা সহজে লোকের ভুলত্রুটি ক্ষমা করেন না।

অন্যদিকে, যাঁরা হৃদয় দিয়ে বাঁচেন, তাঁরা প্রেমিক ও দয়ালু। তাঁরা সহজেই অপরের দোষ ক্ষমা করে দেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, অন্যায়কারীর উপর শাস্তির চেয়ে দয়ার প্রভাব বেশি কার্যকর। তাঁরা জগতের কার্য-কারণ সম্বন্ধ অতিক্রম করে যেতে প্রস্তুত। শুষ্ক যুক্তির চুলচেরা বিচারে তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেন না এবং প্রায়শই প্রচলিত যুক্তির বাইরে গিয়ে চিন্তা করেন। কঠোপনিষদে পাই :

> যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
> জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তৎ যচ্ছেৎ
> শান্ত আত্মনি॥ (১।৩।১৩)

—বিবেকী বা জ্ঞানী বহিরিন্দ্রিয়কে মনে লয় করেন, মনকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে অহংকারে এবং অহংকারকে আত্মস্বরূপে লয় করেন।

আমরা স্বরূপত দিব্য—'অহং ব্রহ্মাস্মি'। জীব-ব্রহ্ম অভেদ। সুতরাং 'মন'-এর (যুক্তি-বুদ্ধি) সিদ্ধান্তকে শীর্ষস্থান দেওয়া যেতে পারে না। আত্মাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে একথাও সত্য যে, এমন মানুষ খুব কমই আছেন যিনি কেবলমাত্র মনের কথা শুনে চলেন, এবং এমন মানুষও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যিনি কেবল হৃদয়েরই নির্দেশে কাজ করেন। আমরা সকলেই 'মন' ও 'হৃদয়'—এই দুই স্তরেই বাস করি। এই বিষয়টির একটু গভীরে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাব, মানুষ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বেশিরভাগ 'হৃদয়' দিয়েই বোঝে। যেমন আমরা যখন মানসিক আঘাত পাই, অতি সহজেই তা অনুভব করতে পারি। কিন্তু অপরকে আঘাত দেওয়ার সময় আমরা ততটা সতর্ক হই না। কারণটা হল, প্রথম ক্ষেত্রে আমরা হৃদয় দ্বারা চালিত হই এবং অপরের ক্ষেত্রে শুষ্ক যুক্তি দিয়ে কাজ চালাই—অর্থাৎ 'মন-বুদ্ধি' দ্বারা চালিত হই।

কিন্তু ঈশ্বর সংক্রান্ত আমাদের বোধ, দৃষ্টিকোণ ও অনুভূতির ক্ষেত্রে আমরা কোন দিক বেছে নেব? এই প্রশ্ন ওঠে, কারণ যিশুর উক্তিদুটির পূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, জীবনশৈলীর এই দিকগুলি সম্পর্কে সচেতনতা প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে চর্চা করতে হলে আমাদের কঠোপনিষদের সেই মন্ত্রটি মনে রাখতে হবে :

> নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য
> ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
> যমেবৈষ বৃণুতেস্তেন লভ্যঃ
> তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥ (২।২৩)

—পাণ্ডিত্য বা মেধা দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না, বহু শ্রুতিনির্দেশ শুনেও নয়, আত্মা যাঁকে বরণ করেন, তাঁর কাছেই স্বরূপত প্রকাশিত হন।

মনে হয়, সত্যে পৌঁছতে হলে বা আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে, মন-বুদ্ধির স্তর থেকে—যুক্তি, নিয়ম-কানুনের মাধ্যমেই, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে জাগতিক স্তরেই যাত্রা শুরু করতে হবে। আমরা ঈশ্বরকে নাম-রূপ দ্বারা বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু সেগুলি সবই প্রাথমিক স্তর। এগুলি সমস্তই ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা। এমন একটি অবস্থা আসবে যখন আমাদের এই সমস্তই ত্যাগ করতে হবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখি, যখন প্রকৃত অর্থে আমরা দিব্যতার বেলাভূমিতে এসে পৌঁছই, তখন ‘‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ’’ (২।৯)। অর্থাৎ, সেই পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করতে না পেরে মন ও বাক্য সেখান থেকে ফিরে আসে।

এ হল আমাদের প্রাচীন ঋষিদের উপলব্ধি। সাধারণ কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয় এক বিশাল জগৎ। ঋষিরা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছেন, আমাদের সমস্ত ভাব প্রকাশের জন্য কেবলমাত্র শব্দ যথেষ্ট নয়। মানবের বোধগম্য নামরূপের সীমানার পারেও আছে ভিন্নতর সত্য। আমাদের ভাষা সেই সত্য প্রকাশে অক্ষম। যদিও, আমাদেরই মতো মানবদেহধারী কতিপয় মহামানব তাঁদের ত্যাগ ও কঠোর তপস্যা দ্বারা সেই সত্যের একটি ঝলক প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা সত্য-প্রকাশক কিছু নির্দেশিকা রেখে গেছেন আমাদের জন্য, যাতে আমরাও সেই সত্যের নাগাল পেতে পারি। এই অবস্থায় পৌঁছতে হলে আমাদের প্রবেশ করতে হয় হৃদয়ের রাজত্বে। তখন শুরু হয় হৃদয়ের নির্দেশে পথ চলা। যুক্তিতর্কের সীমানা ছাড়িয়ে চলতে হয় সে-পথে। কেবলমাত্র তখনই আমরা দিব্য অনন্তত্বের ধারণা গ্রহণ ও সমর্থনের ক্ষমতা লাভ করি।

‘‘তোমরাই জগতের আলোকবর্তিকা’’—কেবল যিশুই যে একথা বলেছেন, তা নয়। আমাদের মহান ঋষিরাও একই কথা বলে গেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে রয়েছে: অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্ যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিস্তস্যৈষা দৃষ্টির্যত্রৈতদস্মিঞ্ছরীরে সংস্পর্শেনোষ্ণিমানং বিজানাতি তস্যৈষা শ্রুতির্যত্রৈতৎ কর্ণাবপিগৃহ্য নিনদমিব নদথুরিবাগ্নেরিব জ্বলত উপশৃণোতি তদেতদ্দৃষ্টং চ শ্রুতঞ্চেত্যুপাসীত চক্ষুষ্যঃ শ্রুতো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ॥

(৩।১৩।৭)

—এই দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, সংসারের ওপরে অনুপম উত্তম লোকসমূহে ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশিত আছেন, তিনিই আবার এই মানবশরীরের মধ্যগত জ্যোতি। যখন এই দেহকে এমনভাবে স্পর্শ করা হয় যে, উষ্ণতা অনুভূত হতে পারে, তখন সেটিই ওই জ্যোতির দর্শনের প্রমাণ। যখন দুটি কান এমনভাবে আচ্ছাদিত করা হয় যে, রথের নির্ঘোষের মতো, বৃষের নিনাদের মতো বা প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দের মতো ধ্বনি শুনতে পারা যায়, তখন সেটিই ওই জ্যোতির শ্রবণের প্রমাণ। ওই জ্যোতিকে দৃষ্ট ও শ্রুত বলে উপাসনা করবে। যিনি উক্ত গুণদ্বয়-বিশিষ্ট রূপে এই জ্যোতিকে উপাসনা করেন তিনি দর্শনীয় ও লোকবিশ্রুত হন।

কোথা সে-জ্যোতি?

সেই জ্যোতি রয়েছে আমাদেরই ভিতরে, অথবা আমরাই জগতের জ্যোতিস্বরূপ। দুটি কথার একই অর্থ। হিন্দুধর্ম ও খ্রিস্টধর্ম ভিন্ন পথ ধরে চলেও পৌঁছেছে সেই একই লক্ষ্যে। মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি যে, যখন আমরা কোনও ধর্মের মর্মে প্রবেশ করি, তখন উপলব্ধি করি যে তারা একই স্থানে এসে মিলিত হয়েছে এবং একই সুরে কথা বলছে। হতে পারে ভিন্ন ভাষা, প্রবচন ভিন্ন, কিন্তু সত্য অভিন্ন। যাই হোক, যে-জ্যোতির কথা যিশু বলেছেন তা সকলের ভিতরেই বিদ্যমান—ছেলে-বুড়ো,

ভাল-মন্দ, ধার্মিক ও তথাকথিত নাস্তিক—সকলের ভিতরে। এই মৌলিক সত্যকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। সেই জ্যোতি ব্যতিরেকে আমাদের কোনও অস্তিত্বই নেই। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এই জ্যোতির বিষয়ে সচেতনই নন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার অস্তিত্ব নেই! যে-বাতাসে শ্বাস নিয়ে আমরা বেঁচে আছি, তার অস্তিত্ব আমরা বোধ করি না। তার অর্থ এই নয় যে বাতাস নেই! আরও অগ্রসর হয়ে কিংবা আরও গভীরে প্রবেশ করে কেউ নিজেকে প্রশ্ন করতে পারে—ওই জ্যোতি কি আমাকে পথ দেখাবে? আমি মনে করি এইরকম দু-একটি চিন্তা আমাদের অন্তরের গভীরে জাগ্রত হওয়া ভাল—আজ রাত্রে যখন আমরা আলো দিয়ে ঘর সাজাব অথবা শিশু যিশুকে দোলনায় দোলাব কিংবা আমাদের প্রার্থনা গৃহে বাতি জ্বালাব। সেই জ্যোতির বৈশিষ্ট্য কী?

বাইরে আমরা যে-আলো দেখি, তা আমাদের হৃদয়ের গভীরে প্রজ্বলিত অন্তর্জ্যোতির কেবল ছায়ামাত্র। সেই অন্তর্জ্যোতিকে যতক্ষণ আমরা উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হতে না দিই, অন্যান্য সমস্ত আলোই অর্থহীন হয়ে পড়ে। সেই অন্তর্জ্যোতির উজ্জ্বল প্রকাশের জন্য আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই।

ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সব দেশের মহাপুরুষগণই আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের গভীরের এই জ্যোতির কথা বলে গেছেন।

সেই জ্যোতির দ্বারা যখন আমাদের জীবন পরিচালিত হয়, তখন কেমন হয় সেই জীবন? সূর্যের কথা ভাবুন। বিজ্ঞানীরা বলেন, বিগত ৪.৬ বিলিয়ন বছর ধরে সূর্য আলো দিচ্ছে এবং হিসেব করে দেখা গেছে যে আগামী আরও ৫ বিলিয়ন বছর বা তারও বেশি সময় ধরে সূর্য আলো দিতে থাকবে। সূর্য তার পছন্দ অনুসারে আলো দেয় না। সে ভাল-মন্দ, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, ধনী-দরিদ্র, ফরসা-কালো, নারী-পুরুষ সকলকে নির্বিচারে আলো দান করে—তার আলো থেকে কেউই বঞ্চিত হয় না। একইভাবে, আমরা যদি অন্তরের জ্যোতি দ্বারা জীবনধারণ করে থাকি, আমাদের জ্যোতিও সকলের কাছে পৌঁছনো উচিত। তা সম্ভব হয় কেবল তখনই, যখন আমরা হৃদয়ের নির্দেশে জীবন পরিচালিত করি। যুক্তির নির্দেশে সংযত হয়ে বা সতর্কভাবে জীবনযাপন করলে তা কখনই সম্ভব নয়। আমাদের হৃদয় কি এত বড় হতে পারে, যেখানে জাতি, ধর্ম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলকে আমরা স্থান দিতে পারি? যিশু যখন বলেছেন, ‘‘তোমরাই জগতের আলোকবর্তিকা”, তখন তিনি আমাদের কাছে এমনটাই দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রদীপ জ্বেলে কেউ ঝোপের মধ্যে তাকে লুকিয়ে রাখে না, বরং তাকে সযত্নে প্রদীপদানিতে রাখে, যাতে সেই আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে (‘No one lights a lamp and keeps it under a bushel; it is kept on a lamp stand so that it may spread its light all around’—LK. II : 33). অন্তরের সেই জ্যোতি গোপনে লুকিয়ে রাখার জন্য নয়, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের উপকারের জন্যেও নয়, তা সকলের কাছে প্রকাশ করবার ও সকলের জন্য কাজে লাগাবার বস্তু।

সেই জ্যোতি বিতরিত হয় বিনামূল্যে

সূর্যই এই পৃথিবীতে প্রাণের নিয়ামক। আমাদের দিন, রাত্রি, নিদ্রা, কর্ম সমস্তই সূর্য দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। আমরা দিন-রাত্রির হিসেবেই আমাদের আয়ু গণনা করে থাকি—যা সূর্য দ্বারাই নির্ধারিত। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, সূর্যের প্রভাবেই এই পৃথিবীতে প্রাণ ধৃত হয়ে আছে বা প্রাণধারণ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তবুও বিনিময়ে সূর্য কিছুই চায় না। অথচ সে নিজেকে জ্বালিয়ে ক্ষয় করে চলেছে। একটি প্রদীপও আলো দান করার জন্য নিজেকে

জ্বালিয়ে শেষ করে ফেলে। এই ক্রিসমাসে, যখন আমরা প্রিয়জনকে উপহার দেব, নিজেদের কয়েকটি সরল প্রশ্ন করতে পারি—আমি কি কেবল আমার সেই সমস্ত বন্ধুদেরকেই উপহার দিতে চাই, যারা প্রতিদান স্বরূপ আমাকে কিছু না কিছু দেবে, এখন না দিলেও পরে দেবে? অথবা আমি এমন কাউকে উপহার দিচ্ছি যে কখনই আমাকে প্রত্যুপহার দিতে পারবে না?

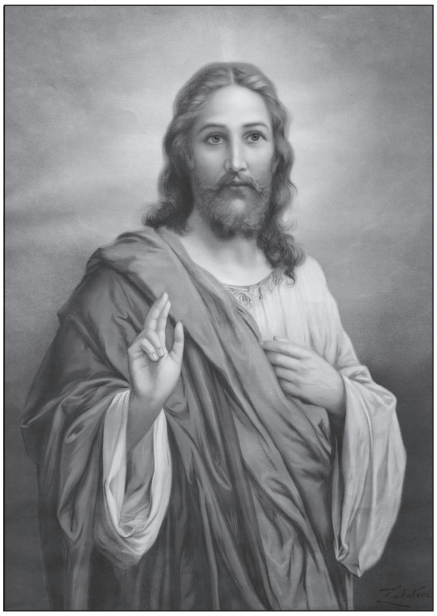

উপহার বা দান সম্পর্কে যিশু একটি সুন্দর নির্দেশ দিয়েছেন : ‘‘সৎ কর্মের অনুষ্ঠান করার সময় সাবধান হবে, কেউ যেন তা দেখে না ফেলে। যদি তুমি লোক দেখিয়ে সৎকর্ম কর, স্বর্গস্থ পিতার কাছ থেকে কোনও পুরস্কার পাবে না। অতএব, যখন দরিদ্রকে দান করবে, ঢাক পিটিয়ে সেটি ঘোষণা কোরো না। অনেকে যশের লোভে তা করে থাকে। দরিদ্রকে দান করার সময় তোমার বাম হাত যেন জানতে না পারে, ডান হাত কী করছে— এমনভাবে গোপনেই দান করতে হয়। তোমার গোপন দান যিশু দেখবেন, তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন (Mt. 6 : 1-4)।

আমরা কী হয়ে উঠব?

যখন আমরা হৃদয়ের নির্দেশে বাঁচতে আরম্ভ করব, সূর্যের মতো, জ্বলে যাওয়া প্রদীপের মতোই আমাদের অহংকার পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। সেখানে আর ‘আমি’ ও ‘ওরা’ ভেদ থাকবে না; থাকবে না বন্ধু-অপরিচিত; ধনী-দরিদ্র, ফরসা বা কালো। সমগ্র জগৎ তখন হয়ে উঠবে ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’। মহা উপনিষদে বলা হয়েছে, ‘‘কেবল ক্ষুদ্র ব্যক্তিরাই ‘এ আত্মীয়’, ‘ও পর’ এই জাতীয় বিভেদসূচক বাক্য বলে থাকে। কিন্তু দয়ালু ও মহৎ ব্যক্তির কাছে সমগ্র জগতই হয়ে ওঠে এক পরিবার’’ (৬।৭২)। হিতোপদেশেও একথা পাওয়া যায় (১।৩।৭১)।

যিশু আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি একবার যখন এক ব্যক্তির গৃহে উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁর মা ও এক আত্মীয়-ভ্রাতা এসে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁরা যিশুর সঙ্গে কথা বলবার জন্য খুবই ব্যাকুল হয়েছিলেন। ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন যিশুকে বলল যে, তাঁর মা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যিশু বললেন, ‘‘কে আমার মা? আমার ভাই-ই বা কারা?’’ তারপর শিষ্যদের উদ্দেশে তাঁর দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, ‘‘এই তো আমার মা ও ভাইয়েরা। আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছানুসারে যে কেউ কাজ করবে, সে-ই আমার ভাই, বোন, আমার মা।’’ (Mt. 13 : 8-9)

অতএব যিশুর কাছে অপরিচিত বলে কেউ নেই শুধু তাই নয়, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কাজ করবে, তাদের কাছে রক্তের সম্পর্কও তুচ্ছ হয়ে যাবে। সকলকেই হয়ে উঠতে হবে ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান—সুতরাং প্রত্যেকেই পরস্পর ভাই-বোন। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলার অর্থ হল অহংকারকে জয় করা এবং মন ও বুদ্ধিকে ‘আমি’ ও ‘তুমি’র গণ্ডি অতিক্রম করে প্রসারিত করা।

লবণের বৈশিষ্ট্য

এবার আমরা যিশুর দ্বিতীয় বাক্যটির প্রসঙ্গে আসব—‘‘তোমরাই ধরিত্রীর লবণ’’। এক্ষেত্রে লবণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

১। সূর্যের আলোয় সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরি হয়। সেইজন্য প্রাচীন কালে লবণকে পৃথিবীর বিশুদ্ধতম পদার্থ বলে মানা হত। অতএব, আমাদের যদি লবণ বলা হয়, আমাদেরও বিশুদ্ধ হতে হবে।

২। লবণ দূষণ, ক্ষয় ও ধ্বংস রোধ করে। প্লুটার্ক বলেছেন, মাংস মৃতদেহের একটি অংশ। এমনি ফেলে রাখলে মাংস নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু লবণ দিয়ে মাংসকে সংরক্ষণ করে রাখা যায় ও তা তাজা থাকে। লবণ যেন মৃতদেহের মধ্যে প্রাণ হয়ে প্রবেশ করে ও তাকে নতুন জীবন দেয়। সুতরাং আমাদের লবণ বলা হলে, আমাদের যে কেবল শুদ্ধ হতে হবে তাইই নয়, আমরা যেখানে উপস্থিত থাকব সেখানে দুর্নীতি দূর করতে হবে। বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য এটি একটি বিরাট দায়িত্ব। আমরা যেখানে থাকি, সেখানকার দুর্নীতি রুখে দেওয়ার সাহস কি আমাদের আছে, নাকি আরও কিছুটা দুর্নীতিমূলক শক্তি আমরা যোগ করে দিই?

৩। লবণ খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। বোধহয় এইটিই লবণের সবচেয়ে বড় গুণ। যে-সমাজে আমরা বাস করি, সেখানে আমরা কোন ধরনের স্বাদ বর্ধন করি? আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কি কেবল আমাদের উপস্থিতিতেই আরও কিছুটা বেশি ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ হয়ে ওঠে? অনেক সময় আমাদের মধ্যে কিছু কিছু মানুষের উপস্থিতি মাত্রেই আমরা আনন্দ ও আত্মবিশ্বাস অনুভব করে থাকি। তাঁরা যে বিশেষ কিছু করেন, তা নয়। কিন্তু তাঁদের উপস্থিতিই অনেক কিছু করে দেয়। এই ধরনের মানুষরাই ধরিত্রীর প্রকৃত লবণ।

৪। লবণের উপস্থিতি দেখা যায় না, কিন্তু অনুপস্থিতি অনুভব করা যায়। অনুপস্থিতি দ্বারাই লবণের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সমাজে আমাদের উপস্থিতিও জাহির করার প্রয়োজন নেই; খবরের কাগজে আমাদের সম্পর্কে খবর নাই বা বের হল; টেলিভিশনের পর্দায়ও আমাদের মুখ দেখানোর প্রয়োজন নেই। তথাপি রান্নার স্বাদ বৃদ্ধির মতোই, যে-সমাজে আমরা বসবাস করি, সেখানকার গুণাগুণ সমৃদ্ধ করে তোলা আমাদের একান্ত কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কারণ প্রচারের আলোর বাইরেও এমন অনেক কিছু ঘটে, যার প্রয়োজন আছে, এবং যিশু হয়তো আমাদের সকলের কাছে সেইরকমই কিছু চেয়েছেন—কারণ শেষ পর্যন্ত তিনিও তেমনই করেছেন।

৫। লবণের আর একটি গুণ হল, লবণ যাতে প্রযুক্ত হয়, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যায়। লবণ নিজের আকারের বা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্রতা হারায়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে সে তার নিজস্ব ধর্ম বিসর্জন দেয়। খাদ্যকে পচন থেকে বাঁচাবার জন্য সে নিজের অহংকার ত্যাগ করে। যার মধ্যে একে রাখা হয়, তাকে সে নিজের লবণত্ব দান করে। ওই খাদ্যের স্বাদ বা গুণাগুণ বর্ধনের জন্য সে নিজের দানাদার আকৃতি হারিয়ে ফেলে। অন্তিম বিশ্লেষণে বলা যেতে পারে, যেমন এক নিঃস্বার্থ ব্যক্তি অপরের কল্যাণের জন্য আত্মবলিদান করেন। যিশু ঠিক এমনটাই করেছিলেন এবং আমাদের জন্যেও তিনি এই নির্দেশই দিয়েছেন।

৬। আমরা সকলেই জানি, এই সমস্ত কাজের জন্য খুব বেশি লবণের প্রয়োজন হয় না। সমাজে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে (স্বাদ-বর্ধন), বা সমাজকে রক্ষা (খাদ্য সংরক্ষণ) করতে বা দুর্নীতি (পচন) রোধ করতে আমাদের খুব বেশি কিছু করতে হবে না। আমরা কীভাবে এইসব করব, সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু আমরা সঠিক কর্ম করলে সেটাই সমাজকে প্রভাবিত করবে।

একটি গল্পের মাধ্যমে আমি এই কথার ইতি টানতে চাই। এটি একটি খাঁটি গল্প, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য এই গল্পটি একটি গভীর বার্তাবাহী। একজন শিল্পী সমুদ্রের ধারে বালি দিয়ে একটি অতি চমৎকার মূর্তি তৈরি করলেন। তারপর তিনি সেই মূর্তির চারদিকে একটি দেওয়াল তুলে দিলেন, যাতে সমুদ্রের ঢেউ তাকে স্পর্শ করতে না পারে। লোকে সেই মূর্তি দর্শন করতে আসতে লাগল, কী অসামান্য দক্ষতায় শিল্পী ওই মূর্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন নিখুঁত কারুকার্য—এই নিয়ে তারা অবাক হয়ে বলাবলি করতে লাগল।

ক্রমে ওই মূর্তি সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল। দলে দলে লোক মূর্তি দেখতে ভিড় জমাতে লাগল। তখন নগরপাল ওই মূর্তিটি সংরক্ষণের জন্য তার চারপাশে আরও বড় দেওয়াল তুলে দিলেন।

এক পূর্ণিমা রাত্রে, যখন সাগর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, নৃত্যরত তরঙ্গ আছড়ে পড়ল বেলাভূমিতে, ঢেউয়ের উন্মত্ততা যেন সেই দেওয়ালকে প্রায় ভেঙে ফেলার উপক্রম করল। একটি ঢেউ এসে মূর্তির কানে কানে বলল, ‘‘এসো, এই চাঁদনি রাতে আমাদের সঙ্গে নাচবে। চলো, আমরা সমুদ্রের গভীরে যাই।’’

মূর্তিটি সেকথায় ভয়ে কেঁপে উঠল, বলল, ‘‘না না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারি না! যদি আমি তোমাদের সঙ্গে যাই, তাহলে আমার শরীর থাকবে না, আমার সৌন্দর্য, আমার আভিজাত্য—সব আমি হারিয়ে ফেলব।’’

তরঙ্গ বলল, ‘‘কিন্তু সেইসমস্ত তো কেবল বাইরে থেকে আরোপিত, একজন শিল্পী তোমাকে রূপ দিয়েছেন। তোমার প্রকৃত সৌন্দর্য তো তোমার সত্তার গভীরে, সেই উজ্জ্বল বালুকাকণায়! মাত্র কয়েকদিন আগে তোমাকে যে-রূপটি দেওয়া হয়েছে—সেটা তো তোমার আসল রূপ নয়!’’

এই আলোচনা কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকল। আরও নতুন নতুন তরঙ্গ এসে যোগ দিল সেই আলোচনায়। অবশেষে মূর্তিটি তাদের সঙ্গে যেতে রাজি হল। প্রথমে তার ভয় করছিল, অনিচ্ছা সহকারে সে ঢেউয়ের মধ্যে পা বাড়াল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে মূর্তিকে আলিঙ্গন করল, অবশেষে মূর্তিটি তার আকার হারিয়ে ফেলল। এখন সমুদ্রের ধারে সে-মূর্তি আর নেই, কিন্তু তার স্থানে রয়েছে মূর্তির স্বাধীন সত্তা—লক্ষ লক্ষ উজ্জ্বল বালুকণা! সারারাত ধরে ঢেউয়ের সঙ্গে নৃত্য করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তখন সমুদ্রের ধারে আসে বিশ্রাম করতে। বাকিরা চলে যায় সমুদ্রের গভীরে। সকালে শ্রমিকরা এসে সমুদ্রের পার থেকে বালুকা সংগ্রহ করে, কিছু বালি দিয়ে মন্দির তৈরি হয়; কিছু বালি রাস্তায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে লোকে পথ চলতে গিয়ে পা পিছলে না পড়ে, কিছু বালি দিয়ে তৈরি হয় দরিদ্রের কুটির। মূর্তিটি তার স্বতন্ত্রতা হারিয়ে ফেললেও সে সমাজের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠে। আমরাও যতই আমাদের অহংকার ত্যাগ করি, ততই সমাজের পক্ষে উপযোগী হয়ে উঠতে পারি।

আমরাই জগতের আলো; ওই আলো যেন আমাদের সকলকে আলোকিত করে। আমরাই ধরিত্রীর লবণ এবং আমরা যেন সমাজের কাছে লবণের মতোই অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারি। সমাজকে যেন দুর্নীতি থেকে আমরা রক্ষা করতে পারি। আমাদের জীবন যেন শুষ্ক হিসেবনিকেশের পরিবর্তে হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হয়। আর এই পথে চলতে গিয়ে আমরা যেন আমাদের অহংকারকে বিসর্জন দেওয়ার মতো সাহস ও শক্তি লাভ করি। এইভাবে এই সমাজকে একটি বিশ্বজনীন পরিবার রূপে গড়ে তুলতে যুক্ত হোক আমাদের অবদান। শুভ হোক ক্রিসমাস ও সকলের উপর বর্ষিত হোক ঈশ্বরের করুণাধারা! ✠